Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনে মুক্তি ও তাহার সাধন

ডঃ সুকুমার সাহু

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
নয়াগ্রাম পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু গভর্নমেন্ট কলেজ

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় পারম্পর্যে দর্শন আলোচনা মূল যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তা হল মুক্তিতত্ত্ব। সুপ্রাচীন বৈদিক কাল থেকে শুরু করে আজ, সমকালীন ভারতীয় দর্শন আলোচনার কালেও এই মুক্তিতত্ত্বের আলোচনা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হলেন তিনি, যিনি তথাকথিত খণ্ডন-মণ্ডনাত্মক দার্শনিক বাদ-বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে যুগোপযোগী দার্শনিক ভঙ্গীতে তাপদগ্ধ জীবের মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন তাঁর কথামৃতে। বর্তমান নিবন্ধটি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' অবলম্বনে মুক্তিতত্ত্ব অনুধাবনের একটি বিশেষ প্রয়াস। লোকপ্রিয় এই কথামৃত যে কেবল ধর্মের আলোচনা মাত্র নয় তাতে মুক্তিতত্ত্বের ন্যায় ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনের মূল তত্ত্বগুলিও যে সমানভাবে উপ্ত রয়েছে তার একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন হল এই প্রবন্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও জীবন-দর্শনের আলোকে মূলতঃ 'মুক্তি' ধারণাটির বিশ্লেষণসহ বন্ধন, বন্ধনের কারণ, জীবন্মুক্তি প্রভৃতি ধারণার ব্যাখ্যাপূর্বক মুক্তিলাভের সাধনপথ চিহ্নিতকরণ এবং উক্ত প্রসঙ্গে আধুনিক কালে মানবমনের সংকীর্ণতা উত্তরণের উপায়রূপে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ ইত্যাদি হল বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য। বর্তমান নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য যে প্রশ্নগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা সেগুলি হল প্রথমতঃ মুক্তি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলির দার্শনিক ভিত্তিটি কী? দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনোক্ত 'মুক্তি'র ধারণাটির উপর ভিত্তি করে ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনের মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধিত দার্শনিক সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করা সম্ভব কিনা? তৃতীয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনোক্ত 'মুক্তি'র ধারণাটির সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা কী? ইত্যাদি। সমগ্র প্রবন্ধটিতে উপরিউক্ত বিষয়গুলির বিস্তৃত পর্যালোচনার পর এবিষয়ে খুব স্পষ্ট ধারণা জন্মায় যে, অদ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করে শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্তি বিষয়ে তাঁর উপদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর এই উপদেশাবলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনোক্ত মুক্তিতত্ত্ব বিষয়ক দার্শনিক সমস্যাগুলি ও তাদের উত্তর নিহিত আছে। সর্বোপরি, শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত মুক্তির সাধনপথের ধারণাটি আসলে ধর্মসমন্বয়ের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি যা সমসাময়িক কালে মানবতাবাদের পথ প্রশস্ত করে।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

মূল শব্দ বা বীজ শব্দ : নিঃশ্রেয়স, বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া, ঈশ্বরানুভব, ঈশ্বরলাভ, শুদ্ধাভক্তি, সপ্তভূমি, নিত্যসিদ্ধ, জীবন্মুক্তি, সাধনপথ, ধর্মসমন্বয়

সর্বধর্মস্বরূপ যিনি প্রকৃত ধর্মসংস্থাপক, যিনি অবতারগণের বরিষ্ঠ তিনি আর কেউ নন, তিনি যুগাবতার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তিনি সর্বধর্মস্বরূপ কারণ তাঁর উপদেশ, তাঁর দর্শন, তাঁর অভিমত, তথাকথিত কোন ধর্ম বিশেষের উপদেশ বা দর্শন নয় বরং তিনি যেন সকল মতের, সকল ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক। তিনি প্রকৃত ধর্মসংস্থাপক কারণ সকল ধর্মমত মূল যে পবিত্র ভূমি থেকে উৎসারিত হয় সেই মানবধর্মের বা মানবতার সংস্থাপন করে তিনি মানব সভ্যতাকে এক নতুন যুগের আঙিনায় এনেছেন। সর্বোপরি তিনি অবতারবরিষ্ঠ কারণ তিনি কেবল শিষ্টের পালন বা সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য দুষ্টের দমনকারী বা দুষ্কৃতের বিনাশকারী অবতাররূপে অবতীর্ণ হননি। তিনি দুষ্ট-শিষ্ট, সাধু-অসাধু, সৎ-অসৎ সকলের পরিত্রাণের জন্য অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য, সকল মানুষের মুক্তির জন্য। বর্তমান নিবন্ধটির প্রতিপাদ্য হল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে মুক্তি ও তার সাধন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্বঃ-ই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ লোকপ্রিয় ভঙ্গিতে কথাচ্ছলে মুক্তি বিষয়ক নানান উপদেশ জনসমক্ষে উপস্থাপন করেছেন। এমতাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের মুক্তি বিষয়ক এই উপদেশাবলির দার্শনিকিকরণ বা তাত্ত্বিকিকরণ সম্ভব কিনা তার আলোচনাই উক্ত প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের আলোকে বন্ধন, মুক্তি, জীবন্মুক্তি, মুক্তির সাধন ইত্যাদির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হবে এবং ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলির দার্শনিকভিত্তি ও সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা উল্লিখিত হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুক্তিতত্ত্বের গূঢ় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে সাধারণভাবে মুক্তি বিষয়ে কিছু কথা উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে মুক্তিতত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শনের প্রতিটি সম্প্রদায়েরই মূল লক্ষ্য হল সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ দুঃখ-দুর্দশা, যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবের মুক্তিপথের অনুসন্ধান। 'মুক্তি' শব্দটি সংস্কৃত 'মুচ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ হল 'মোক্ষণ'। সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনে মুক্তি 'মোক্ষ' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এছাড়াও ভারতীয় আধ্যাত্মশাস্ত্রে এই 'মুক্তি' বা 'মোক্ষ' শব্দের বিভিন্ন পর্যায়বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেমন, 'কৈবল্য', 'নির্বাণ', 'অপবর্গ', 'নিঃশ্রেয়স' ইত্যাদি। তবে 'মোক্ষ' বা 'মুক্তি' শব্দটি মূলতঃ বন্ধন মুক্তি বা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। উক্ত প্রসঙ্গে প্রদত্ত 'বন্ধন' শব্দটি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে; যেমন, বিষয়াসক্তিই বন্ধন, বাসনায় আবদ্ধ হওয়াই বন্ধন, দেহকে আত্মা মনে করাই বন্ধন, সুদৃঢ় সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই বন্ধন, ভোগের ইচ্ছাই হল বন্ধন ইত্যাদি। এবম্বিধ প্রকারে বন্ধন ব্যাখ্যাত হলেও জীবন-মরণ চক্রে

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

আবদ্ধ হয়ে দুঃখ-দুর্দশা ভোগই মূলতঃ বন্ধন নামে অভিহিত হয়। সাধারণ অর্থে জীবন-মরণ চক্রের এই বন্ধন ছিন্ন করে দুঃখ-দুর্দশার আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মুক্তি।

অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শনে এই মুক্তি বা মোক্ষই চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে পরম-পুরুষার্থরূপে পরিগণিত হয়েছে। এই অভিপ্রায়েই বেদান্ত-পরিভাষাকার বলেন – "ইহ খলু ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্যেষু চতুর্বিধ-পুরুষার্থেষু মোক্ষ এব পরম-পুরুষার্থ" [1]। কারণ মোক্ষ নিত্য এবং তদ্ব্যাতিরিক্ত অপর তিনটি পুরুষার্থের অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষ এবং শ্রুতি প্রমাণ সিদ্ধ। আবার এই মোক্ষ নিঃশ্রেয়স নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, যা নিশ্চিতরূপে শ্রেয়ঃ তাই নিঃশ্রেয়স। ধর্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে অর্থ ও কাম শ্রেয়ঃ নয় প্রেয়, এবং ধর্ম শ্রেয়ঃ হলেও নিত্য শ্রেয়ঃ নয়; তাই তাকে নিশ্চিতরূপে শ্রেয়ঃ বলা যায় না। নিত্য শ্রেয়ঃ রূপে মোক্ষই একমাত্র নিঃশ্রেয়সরূপে স্বীকৃত।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মানব জীবনের পরম অভীপ্সিত যে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ বা মুক্তি, সে বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ কী? মুক্তি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ উপলব্ধি করতে গেলে প্রথমে জানা প্রয়োজন - শ্রীরামকৃষ্ণের মতে বন্ধন কী, কার বন্ধন হয়, বন্ধনের কারণ কী ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণ খুব জটিল দার্শনিক বিচারের মাধ্যমে বন্ধনের স্বরূপ বা লক্ষণ নিরূপণ না করলেও তাঁর দর্শন পাঠে এটুকু পরিষ্কার হয় যে সাধারণ ভাবে তিনি অজ্ঞানবশে বিষয়-সুখ-ভোগাসক্ত সংসারী জীবের পুনঃ পুনঃ জীবন-মরণ চক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃখ-দুর্দশা ভোগকেই বন্ধন বলেছেন। তবে তিনি একদা জীবের স্ব-সচ্চিদানন্দস্বরূপতা ভুলে দুঃখ-কষ্ট ভোগকেও বন্ধন বলে অভিহিত করেছেন। জীবাত্মাই যে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে বিষয়ে সকলেই একমত। শ্রীরামকৃষ্ণ সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ এই জীবাত্মাকে অষ্টপাশ জড়িত আত্মা বলে বর্ণনা করেছেন। জীবের এই অষ্টপাশ হল ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ ও পৈশুণ্য বা ক্রূরতা। কিন্তু তাঁর মতে, সংসারী জীব মাত্রেই বন্ধনে আবদ্ধ নয়। সংসারী জীব চার প্রকার: বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব এবং নিত্যজীব।[2] বদ্ধজীব হল তারা যাদের 'কোন হুঁস নেই', ঘোর বিষয়াসক্ত, কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ, ঈশ্বর বিমুখ এবং অজ্ঞ। এরা অজ্ঞানবশে বিষয় সুখে আবিষ্ট হয়ে চরম ভোগ-বিলাসে জীবন অতিবাহিত করতে চায়, কিন্তু আসলে পদে পদে দুঃখ ভোগ করে। দুঃখ-দুর্দশা ক্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এদের ভগবান চিন্তা আসে না, মুক্তি চিন্তা আসে না[3]। সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও যারা মুক্তি কামী হয়, মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, সংসার তথা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত নয়, সংসার যে দুঃখ দায়ক এই উপলব্ধি যাঁদের আছে, তাঁরা মুমুক্ষুজীব। এই মুমুক্ষুজীবের মধ্যে সবাই কিন্তু মুক্ত হন না। কেবল যাঁরা বিষয় বাসনায় অত্যন্ত বিমুখ হয়ে ঈশ্বরপাদপদ্মে স্থির চিত্ত হন এবং ঈশ্বরকৃপা লব্ধ হয়ে মুক্তি লাভ করেন তাঁরাই মুক্তজীব। মুমুক্ষুজীবের মতো মুক্তজীবগণও সংসারে অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত সংসার তাঁদের পাতকুয়া বোধ হয়; ভালো লাগে না"[4]। কিন্তু যাঁরা সংসারে থাকেন কেবল লোকশিক্ষার জন্য অথচ সংসারে লিপ্ত হন না, যাঁরা নিত্যসিদ্ধ,

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

ঈশ্বরকোটি, সাধনার আগে যাঁরা ঈশ্বরলাভ করেন তাঁরা হলেন নিত্যজীব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন - নারদ, প্রহ্লাদ, এমনকি নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ) এবং রাখালেরাও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখগণও) নিত্যসিদ্ধ। সুতরাং এই চতুর্বিধ জীবের মধ্যে নিত্যজীব ব্যতীত সকলেই প্রাথমিকভাবে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ এবং দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট।

এখন প্রশ্ন হল জীবের বন্ধন হয় কেন? অর্থাৎ বন্ধনের কারণ কী? এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, ঈশ্বরই হলেন বন্ধন ও মুক্তির কর্তা। তাঁর মায়াতে জীব বন্ধনে আবদ্ধ হয় আবার তাঁরই দয়াতে মুক্ত হয়। এই বন্ধন ও মুক্তি হল তাঁর লীলা খেলা।[5] এখন প্রশ্ন হলো, যে মায়ায় জীব সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় সেই মায়ার স্বরূপ কী? শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন স্থলে মায়ার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেমন কোথাও তিনি বলেন, "কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। ওর ভিতর অনেকদিন থাকলে হুঁস চলে যায় – মনে হয় বেশ আছি"[6]। আবার কোথাও বলছেন, "জীবের অহংকারই মায়া"[7], আবার তিনি একদা বলছেন, "মায়া মানে আত্মীয়ে মমতা......... মায়াতে অজ্ঞান করে রাখে, বদ্ধ করে রাখে"[8], আবার কখনো প্রার্থনা করছেন, "হে ঈশ্বর তোমার এই ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্য - আমি চাই না – আমি তোমায় চাই"[9], আবার তিনি বলছেন, "এ সংসার তাঁর (ঈশ্বরের) মায়া"[10], আবার এক জায়গায় তিনি বলছেন, "মায়া আবরণস্বরূপ"[11] ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের মায়া সম্পর্কিত উপরোক্ত প্রকার বক্তব্যগুলি থেকে একটি বিষয় খুবই পরিষ্কার যে, তিনি জীবের বন্ধনকারক মায়াকে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন - প্রথমতঃ ঈশ্বরপক্ষে, দ্বিতীয়তঃ জীবপক্ষে। ঈশ্বরপক্ষে তিনি ঈশ্বরের এই বৈচিত্র্যময় জগদ্রূপবিলাসকে বা সংসারকে মায়ারূপে আখ্যায়িত করেছেন।[12] আবার তিনি মায়াকে আদ্যাশক্তি মহামায়ারূপে গণ্য করে জাগতিক সবকিছুকে সেই আদ্যাশক্তির অধীন বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ উক্তপক্ষে তিনি যেমন সংসারকে মায়া বলছেন তেমনি আবার সংসারের কারণস্বরূপ আদ্যাশক্তিকেও মায়া বলছেন। আসলে তাঁর মতে, ঈশ্বরই মায়া হয়েছেন, ঈশ্বর - মায়া - জীব – জগৎ সবই এক।[13] এরপর তিনি জীবপক্ষে মায়াকে বোঝাতে বলছেন - জীব যা কিছু দেখছে, শুনছে, চিন্তা করছে - সবই মায়া। এই মায়াতে বিদ্যাও আছে আবার অবিদ্যাও আছে। অর্থাৎ মায়ার দুইরূপ - বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া। তন্মধ্যে অবিদ্যামায়া জীবকে ঈশ্বরবিমুখ করে, এই মায়া হল আসলে পঞ্চভূত, রূপরসাদি ইন্দ্রিয় বিষয় অর্থাৎ জীবের ভোগ্য বিষয় যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনী-কাঞ্চন বলেছেন। এই ভোগ্য বিষয়ের মোহে জীব ঈশ্বর ভুলে থাকে। এই মায়ার প্রভাবেই জীব সংসারী হয়। আসলে ত্রিগুণাত্মক এই মায়া হল আবরণ স্বরূপ। যা একদিকে যেমন জীবের স্ব-স্বরূপ ভুলিয়ে দেয় তেমনি জীবের নিকট অনিত্যকে নিত্য বলে এবং নিত্যকে অনিত্য বলে; অর্থাৎ সংসারকে পরমার্থ বলে বোধ করায়। এইভাবে এই মায়া জীবকে অজ্ঞান করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, এই মায়া থেকেই জীবের মধ্যে অহংকারের জন্ম হয়। জীব নিজেকে কর্তা মনে করে এবং সবকিছুতেই 'আমার' বোধ হয়। এই অহংকারের ফলেই জীব ঈশ্বরকে ভুলে থাকে এবং সে যে নিজে সচ্চিদানন্দস্বরূপ তা ভুলে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকে। এটিই হল জীবের

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

বন্ধন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “যখন তাঁকে (ঈশ্বরকে) ভুলে মানুষ ‘আমার আমার’ করে, মায়ায় বন্ধ হয়ে কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে আরও ডোবে ! মায়াতে এমনই মানুষ অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারে না।”[14] অর্থাৎ এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ঈশ্বরের অবিদ্যাবিলাসে মুগ্ধ হয়ে তথা অহংকারের বশবর্তী হয়ে জীব যখন নিজের সচ্চিদানন্দস্বরূপতা বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে ও ঈশ্বরকে ভুলে বিলাস-ব্যাসনে সুখী হতে চায় কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দুঃখ ভোগ করে তখনই তাকে জীবের বন্ধন বলে। তাই বন্ধনের কারণ হল মূলতঃ মায়া, যা কখনো অজ্ঞানরূপে, কখনো অহংকাররূপে, কখনো ভোগ্য কামিনী-কাঞ্চনরূপে জীবের বন্ধনের কারণ হয়। তবে এই স্থলে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে যদিও জীবের বন্ধনের মূল কারণ মায়া তবুও মায়া মাত্রই বন্ধন কারক নয়। কারণ পূর্বে উক্ত হয়েছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ার দুই রূপের কথা বলেছেন, বিদ্যামায়া এবং অবিদ্যামায়া। তন্মধ্যে অবিদ্যামায়া জীবের বন্ধন কারক হলেও জীব বিদ্যামায়ার আশ্রয় গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, সাধুসঙ্গ, বৈরাগ্য ইত্যাদি জন্মায় যা জীবকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায় এবং পরিণামে মোক্ষ কারক হয়। এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, যদিও মোক্ষ বা মুক্তিলাভ বা ঈশ্বরলাভ করতে হলে জীবকে মায়ার রাজ্য অতিক্রম করতে হয় তথাপি সিদ্ধপুরুষগণ কিন্তু ঈশ্বরলাভের পরেও বিদ্যামায়া রেখে দেন লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য। তাই বিদ্যামায়া কোনভাবেই বন্ধন কারক নয়।

প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞাসা হয় যে, জীবের মুক্তি আসলে কী? এই মুক্তির অবস্থাই বা কেমন? মুক্তি লাভের পথে অন্তরায় কী? জীবের এই বন্ধন-মুক্তি কীভাবে সম্ভব? অর্থাৎ মুক্তির সাধন কী? ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণ তথাকথিতভাবে গূঢ় দার্শনিক সমস্যাগুলির আলোচনা না করলেও মুক্তিতত্ত্ব বিষয়ক এইসব দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর যে তাঁর উপদেশামৃতে ব্যাপকভাবে উক্ত হয়েছে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুক্তিই যে জীবনের পরম অভীপ্সিত বা পরম কাম্য বা পরম উদ্দেশ্য সে বিষয়ে সকলেই একমত। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভ।[15] এক্ষেত্রে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ঈশ্বর বা পরমাত্মা তো বাক্য-মনের অগোচর। এমনকি ভগবতী শ্রুতিও যেখানে বলেছেন – “নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।”[16] অর্থাৎ সেই আত্মাকে বাক্ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয় কিংবা চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় কিংবা মনরূপ অন্তঃকরণের দ্বারা জানা যায় না সেখানে এতদ্রূপ ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভ অথবা পরমাত্মদর্শন বা পরমাত্মবস্তুলাভ কীভাবে সম্ভব। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই সমাধান দিয়েছেন যে, ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভ সম্ভব; শ্রুতিতে যে তাঁকে ‘অবাঙ্মনসোগোচর’ বলা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য হল - তিনি অশুদ্ধ, বিষয়াসক্ত মনের অগোচর; কিন্তু তিনি শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর, শুদ্ধ চিত্তে তাঁর দর্শন সম্ভব[17]। এখন প্রশ্ন হল এই ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভ আসলে কী? এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, “ঈশ্বর বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন। তিনি ভিতর থেকে মনের নানা অবস্থা করছেন। ষড় চক্র ভেদ হলে মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। এরই নাম ঈশ্বরদর্শন।”[18] তাৎপর্য হল এই যে, ঈশ্বর তাঁর লীলাবশেই জীবের

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

অন্তর্জগত তথা বহির্জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন। তাঁরই নির্দেশে মন নানা স্থানে অবস্থান করে। এমতাবস্থায় মন যখন মূলাধারচক্র, স্বাধিষ্ঠানচক্র ও মণিপুরচক্র অতিক্রম করে অনাহতচক্রে অবস্থান করে তখন তার প্রথম জ্যোতিঃদর্শন হয়, অর্থাৎ জীবাত্মাকে সে শিখার মতো দেখে। এই চক্র অতিক্রম করে মন যখন পরবর্তী চক্র অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্রে অবস্থান করে তখন তার কেবল ঈশ্বরের কথা শুনতে ইচ্ছা করে। তারপর মন যখন এই বিশুদ্ধচক্র অতিক্রম করে আজ্ঞাচক্রে অবস্থান করে তখন তার ঈশ্বরদর্শন হয়, অর্থাৎ তখন জীবের জ্ঞান হয় যে ঈশ্বরই কর্তা - জীব অকর্তা, ঈশ্বর প্রভু - জীব দাস, ঈশ্বর যন্ত্রী - জীব যন্ত্র, ঈশ্বরই সত্য - সংসার অনিত্য। এই জ্ঞান হলেই জীবের মুক্তি হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' 'নাহং' আমি কেহ নই, হে ঈশ্বর! তুমি কর্তা; আমি দাস তুমি প্রভু – তখন নিস্তার; তখনই মুক্তি।"[19] কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, এটি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরলাভ নয় কারণ এই স্তরেও ঈশ্বরের সঙ্গে একটু ব্যবধান থেকে যায়। যেমন লণ্ঠনের ভিতরের আলো ছোঁয়া যায় না কাঁচরূপ ব্যবধান থাকার কারণে তেমনি মায়াকার্য-মনের যেহেতু তখনও লয় হয় না তাই মন এস্থলে সেই ব্যবধান তৈরি করে। কিন্তু জীব যখন এই ষড় চক্র অতিক্রম করে তখন মনের লয় হয়, জীব মায়ার রাজ্য অতিক্রম করে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হয়ে যায়, জীবের সমাধি হয়। এটিই প্রকৃতপক্ষে জীবের মুক্তাবস্থা।

এখন এই মুক্তাবস্থা কেমন বা মুক্তাবস্থায় জীবের স্বরূপ কেমন হয় – এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী পর্যালোচনা করা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে মুক্তাবস্থায় ব্যক্তির স্ব-স্বরূপের উপলব্ধিরূপ ঈশ্বরদর্শন হওয়ায় সে পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে ওঠে, তাই তার বিচার বন্ধ হয়ে যায়। তখন তার সমস্ত প্রকার ভেদ বুদ্ধির নাশ হয় এবং অখণ্ডানন্দের উপলব্ধি হয়। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব বালকের স্বভাব প্রাপ্ত হন, তাঁর কাম-ক্রোধাদি আর থাকে না। তিনি আর পাপ করতে পারেন না এমনকি তাঁর কর্ম ত্যাগ হয়, তাঁকে আর কর্ম করতে হয় না। যিনি সিদ্ধ হয়েছেন অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ করেছেন তিনি সেদ্ধ বীজের ন্যায় আর সন্তান উৎপাদনাদি কোন সৃষ্টি কর্মই করতে পারেন না। ঈশ্বরদর্শনে অহং এর নাশ হয় কিন্তু জীবদ্দশায় আমি'টা নামমাত্র থাকে। এই অবস্থায় দেহাত্মবোধ চলে যায়, সুখ দুঃখের বোধ থাকে না। এই সময় ব্যক্তি সমস্ত বাহ্য ঐশ্বর্য ভুলে গিয়ে কেবল ঈশ্বরানন্দেই মগ্ন থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির চারটি লক্ষণের কথা বলেছেন; সেগুলি হল: বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ এবং পিশাচবৎ। তাঁর মতে, যিনি ঈশ্বরলাভ করেন তিনি বালকবৎ হয়ে যান কারণ তিনি শিশুদের মতো সরল, উদার, অহংকারহীন, আসক্তিহীন এবং সদানন্দময় হয়ে আচরণ করেন। তিনি 'উন্মাদবৎ' হয়ে যান কারণ তিনি উন্মাদের মতো কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন, কখনো নাচেন, কখনো গান করেন। আবার এইসময় তিনি 'জড়বৎ' হয়ে কিছুতে যেন বিভোর হয়ে থাকেন এবং কর্মহীন, প্রচেষ্টাহীণ আচরণ করেন। তিনি 'পিশাচবৎ' হয়ে যান কারণ এই সময় তাঁর শুচি-অশুচি, আচার-অনাচার ইত্যাদি প্রকার ভেদবুদ্ধি থাকে না।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

এক্ষেত্রে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, জীবদ্দশায় এই সংসারে থেকে কি মুক্তিলাভ সম্ভব? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, এই সংসারে সবার যে মুক্তিলাভ সম্ভব তা শ্রীরামকৃষ্ণ খুব স্পষ্ট ভাবে বলেছেন। তিনি বলেন, 'সকলেরই মুক্তি হবে। তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চলতে হয়।'[20] স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরই গুরুরূপে অবতীর্ণ হন লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য। তাই গুরুর উপদেশ অনুসারে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি ইত্যাদিরূপ চিত্তমল (মনের ময়লা) দূরীভূত হয়ে চিত্তশুদ্ধ হলে ঈশ্বরলাভ অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল এই যে, জীব কি জীবদ্দশাতেই মুক্তি লাভ করতে পারে নাকি দেহান্তে? অর্থাৎ মূল কথা হল জীবন্মুক্তি কি সম্ভব? শ্রীরামকৃষ্ণের মতে জীবন্মুক্তি সম্ভব। এই বিষয়ে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "সংসারী জীব যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে। যার জ্ঞান হয়েছে, তাঁর এখান সেখান নেই, তাঁর সব সমান"[21]। সেই সঙ্গে তিনি জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করেছেন। যাঁর 'ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছুই করছিনা, তিনিই প্রকৃত কর্তা, আমি অকর্তা' - এই প্রকার বোধ জন্মায় তিনিই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহাত্ম-বুদ্ধি চলে যায়, দেহের সুখ-দুঃখে তিনি সুখ-দুঃখ বোধ করেন না; তিনি কখনো দেহের সুখ চান না ইত্যাদি। এছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ জীবের প্রভেদ প্রসঙ্গে যে নিত্যজীব বা সিদ্ধ-পুরুষের উল্লেখ করেছেন, এমনকি নারদ, শুকদেব, প্রহ্লাদ, জনকাদির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ মুক্ত অবস্থায়ও জীবিত ছিলেন, তাঁরা নিত্যসিদ্ধ। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের মতে জীবন্মুক্তি সম্ভব।

এখন প্রশ্ন হল জীবের এই বন্ধন মুক্তি বা ঈশ্বরলাভ কীভাবে সম্ভব? এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মতে এই মুক্তি বা ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভ কিন্তু হঠাৎলব্ধ কোন বিষয় নয় বরং দীর্ঘসাধন-সাধ্য। তাই ব্যক্তিকে এই সাধনসিদ্ধ হওয়ার জন্য বেশ কতগুলি স্তর অতিক্রম করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, ব্যক্তি যখন ঈশ্বরলাভের জন্য মনস্থির করে সবে-মাত্র পথে উঠেছেন তখন তিনি 'প্রবর্তক'। তারপরে তিনি যখন একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাধন-ভজন, পূজা, জপ, কীর্তন, ধ্যান ইত্যাদি করেন তখন তিনি 'সাধক'। এরপর যখন তাঁর 'ঈশ্বর আছেন' - এই বোধ জন্মায় বা উপলব্ধি হয় তখন তাঁকে 'সিদ্ধ' বলে। সবশেষে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম-ভক্তির দ্বারা যখন তাঁর বিশেষ আলাপ হয় তখন তাঁকে 'সিদ্ধের সিদ্ধ' বলা হয়।[22] এই 'সিদ্ধের সিদ্ধ' ব্যক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট সাধক। যাইহোক, দীর্ঘসাধন-সাধ্য যে ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভ বা মুক্তি যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের উদ্দেশ্য বলেছেন সেই মুক্তিলাভ বা ঈশ্বরলাভ কীভাবে সম্ভব তার আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়টিতে মনোযোগ দেওয়া খুব জরুরি হয়ে ওঠে তা হল - শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, "ঈশ্বরই বন্ধন ও মুক্তির কর্তা"[23]। তাই অজ্ঞানের তিমিরে অন্ধ যে বদ্ধ জীব তার জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন কীভাবে সম্ভব অর্থাৎ মুক্তি কীভাবে সম্ভব? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন "সকলের মুক্তি সম্ভব কিন্তু সকলকে গুরুর উপদেশ মেনে চলতে হবে। ঈশ্বর নিজেই পরিত্রাণের জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সচ্চিদানন্দই গুরু।"[24] গুরু-ই কোনটা সৎ - কোনটা অসৎ, কোনটা

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

নিত্য - কোনটা অনিত্য, জীবের আসল স্বরূপ কী ইত্যাদি জানিয়ে দেন। এইভাবে গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়াই সাধন পথের প্রথম ধাপ। তাই গুরুর কৃপা ব্যতীত স্বরূপদর্শন তথা মুক্তি কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হলে মুমুক্ষুর অহং ত্যাগ হয় কারণ গুরু-ই তাঁকে বুঝিয়ে দেন ঈশ্বরই সবকিছুর কর্তা, বাকি সবাই অকর্তা; জীব ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র। গুরুর কৃপায় এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে মুমুক্ষুর 'আমি অকর্তা' এইরূপ প্রাথমিক বোধ জন্মায় এবং তিনি অহং ত্যাগ করে ও ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থী হয়ে তাঁর শরণাগত হন। শরণাগতিতে ঈশ্বরের প্রতি মুমুক্ষুর ভালবাসা জন্মায়, ঈশ্বরের প্রতি তীব্র ব্যাকুলতা আসে, তিনি পাগলের মতো তাঁকে ডাকতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিন জনের ভালবাসা, এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।"[25] শরণাগত মুমুক্ষুর ঈশ্বরের প্রতি তীব্র ব্যাকুলতা সত্ত্বেও ঈশ্বরের কৃপালাভ তাঁর হবে না যদি না তিনি শুদ্ধচিত্তের অধিকারী হন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, ছুঁচ কাদায় ঢাকা থাকলে চুম্বক যেমন সেটিকে টানে না কিন্তু কাদা ধুয়ে গেলে চুম্বক যেমন সেটিকে টানে, তেমনি বিষয়াসক্তিতে মন মলিন হয়ে থাকলে ঈশ্বরও টানেন না; তাই ঈশ্বরের কাছে কাঁদতে হয়, তাতে মনের ময়লা ধুয়ে যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি ইত্যাদি হল মনের ময়লা। এই ময়লা দূরীভূত হলে তীব্র বৈরাগ্য জন্মায়, চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি জন্মায়। যে ভক্তিতে কোনরূপ চাওয়া-পাওয়া থাকে না, কেবল অনুরাগ থাকে, ভালবাসা থাকে তাকে রাগভক্তি বা অহেতুকী ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি বলে। এইরূপ ভক্তি জন্মালে ঈশ্বর ভক্তকে কাছে টেনে নেন এবং ভক্ত তাঁর কৃপা লাভ করে। এইরূপে ঈশ্বরের কৃপা হলে তিনি যে জ্ঞানালোকে সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করেন সেই জ্ঞানালোক তিনি নিজের উপরে আপাতিত করে নিজের মায়ারূপ অবগুণ্ঠন মোচন করেন। তখন ঈশ্বরের দর্শন হয়। এরপর মুমুক্ষু যখন মায়ার রাজ্য অতিক্রম করে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হন তখনই তাঁর সমাধি হয় বা ঈশ্বরলাভ হয় বা প্রকৃত মুক্তিলাভ হয়।

এখন দেখার মুক্তির সাধন বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ কী, অর্থাৎ তাঁর মতে মোক্ষমার্গ কী। খুব সাধারণভাবে মোক্ষমার্গ বা মুক্তির সাধন বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'নানা পথ দিয়া, নানা ধর্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বরলাভ হতে পারে'[26]। অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন শাস্ত্রে মুক্তি লাভের বা ঈশ্বরলাভের জন্য যে পথ নির্দেশিত হয়েছে তাদের সবকটির দ্বারা যে ঈশ্বরলাভ সম্ভব সে বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন সংশয় নেই কারণ তিনি নিজে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব; এমনকি ইসলাম, খ্রীষ্ট প্রভৃতি ধর্মের সাধনপথ অবলম্বন করে সিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই তাঁকে সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক বলা হয়। তাঁর মতে, ঈশ্বরলাভের পথ অনন্ত; তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি যে পথ দিয়ে যাওয়া হোক না কেন আন্তরিক হলে ঈশ্বরলাভ সম্ভব।[27] তবে অনন্ত সাধন পথের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগের উল্লেখ করেছেন।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

জ্ঞানযোগ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, যে পথ দিয়ে স্ব-স্বরূপকে জানা যায় তাই জ্ঞানযোগের পথ। জ্ঞানযোগে 'ব্রহ্মই আমার স্বরূপ' - এই বোধ হয়।[28] এই পথ হল বিচারের পথ, নেতি নেতি বিচারের পথ। ব্রহ্ম এ-নয়, ব্রহ্ম ও-নয় অর্থাৎ ব্রহ্ম শরীর নয়, ব্রহ্ম মন নয়, ব্রহ্ম বুদ্ধি নয়, ব্রহ্ম জীব নয়, ব্রহ্ম জগৎ নয় – এইরূপে বিচার করতে করতে মন যখন ষড়চক্র ভেদ করে সপ্তভূমিতে পৌঁছায় তখন মনের লয় হয়, তখন সমস্ত বিচারের সমাপ্তি হয় এবং সাধকের সমাধি হয়। তখনই সাধক উপলব্ধি করেন যে ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু, এই নাম-রূপাত্মক জগৎ মিথ্যা; এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আত্মস্বরূপ। তাই এই পথ হল আত্মস্বরূপ উপলব্ধির পথ। এইরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরলাভ বা মুক্তিলাভ হয়।

আবার কর্মযোগ বিষয়ে তিনি বলেন, নিষ্কাম ভাবে কর্ম সম্পাদনই কর্মযোগ। 'আমি কর্তা' – এইরূপ অহংকার ত্যাগ করে ব্যক্তি যখন অনাসক্ত চিত্তে কর্ম করেন তখন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা জন্মায় এবং এইভাবে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়। আবার অনাসক্ত হয়ে সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা ও ভক্তি সহকারে তাঁকে লাভ করার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে তাঁর পূজা, নামগান, প্রার্থনা ও ধ্যানাদি যে ক্রিয়া সকল তাও কর্মযোগ। এই কর্মযোগের উদ্দেশ্যও ঈশ্বরলাভ।

শেষে তিনি ভক্তিযোগ বিষয়ে বলেন, ব্যক্তি যখন 'আমি দাস – তুমি প্রভু', 'আমি ভক্ত – তুমি ভগবান' – এই ভাব নিয়ে ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন করে এবং তাতে মন স্থির ক'রে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে - 'হে ঈশ্বর আমায় জ্ঞান দাও, আমাকে দেখা দাও', তখন তাকে ভক্তিযোগ বলে। এইভাবে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে তাঁর কৃপা লাভ করে, তাঁর দেখা পাওয়া যায় বা ঈশ্বরলাভ করা যায় বা মুক্তি লাভ করা যায়।

এইভাবে তিনি খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে জ্ঞান কিংবা কর্ম কিংবা ভক্তি যে মার্গই অবলম্বন করা হোক না কেন প্রত্যেক পথেই ঈশ্বরলাভ বা মুক্তিলাভ সম্ভব। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে যুগোপযোগী সাধনমার্গ নির্দেশের জন্য তিনটি মার্গের মধ্যে তুলনা ক'রে বলেন – এই কলিযুগে জ্ঞানযোগ কিংবা কর্মযোগ উপযোগী নয়। কারণ জ্ঞানযোগ কিংবা কর্মযোগ এই কলিযুগে খুবই কষ্টসাধ্য। কলিতে জীবের অন্নগত প্রাণ তাই দেহাত্মবুদ্ধি সহজে যাওয়ার নয়। দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না। অন্যদিকে কলিতে জীব স্বল্পায়ু ও অন্নগত প্রাণ হওয়ায় শাস্ত্র নির্দেশিত কর্ম করার সময় যেমন খুব কম, তেমনি নিষ্কাম ভাবে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করাও খুব কঠিন। ঈশ্বরলাভ না করলে প্রকৃত অনাসক্ত হওয়া যায় না। আর অনাসক্ত চিত্তে নিষ্কামভাবে কর্ম না করলে সেই কর্ম আবার বন্ধনের কারণও হয়। তাই এই কলিযুগে ভক্তিই যুগধর্ম, কারণ ভক্তির পথ সহজ। অন্যান্য পথের তুলনায় এই পথে সহজে ঈশ্বরলাভ হয়। পরিশেষে তিনি প্রতিটি সাধনমার্গের গন্তব্য বিষয়ে যাতে কোন সংশয় না তৈরি হয় সেজন্য তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, "ভক্তিযোগ যুগধর্ম – তার এ-মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্মী

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে যিনি ব্রহ্ম জ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তা হলেও সেই জ্ঞানলাভ করবেন। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন"[29]। আবার তিনি এও বলেন যে 'জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে; আর ভক্তরা তাঁকেই ভগবান বলে'। এইভাবে তিনি যোগত্রয়ের মধ্যে সমন্বয় বা অবিরোধ সাধন করেছেন।

উপরোক্ত প্রকারে মুক্তি ও তাহার সাধন বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী যথামতি উপলব্ধির পর উক্ত প্রসঙ্গে যে কয়টি বিষয়ের জিজ্ঞাসা স্ফুরিত হয় সেই বিষয়গুলির পর্যালোচনাই প্রবন্ধান্তের প্রতিপাদ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের মুক্তিতত্ত্ব বিষয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসিত হয় যে, ঈশ্বরই যদি বন্ধন ও মুক্তি দুয়েরই কর্তা হন তাহলে বন্ধন মুক্তিতে জীবের ভূমিকা কী? আরও স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বরের কারনেই যদি জীব বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যেহেতু ঈশ্বরই বন্ধন ও মুক্তি দুয়েরই কর্তা, তাহলে বন্ধন জনিত জীবের দুঃখ ভোগ অন্যের দোষে নিরপরাধ ব্যক্তির সাজা প্রাপ্তির ন্যায় অকৃতাভ্যাগম্ দোষের প্রসঙ্গ হয় না কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে 'ঈশ্বরই বন্ধন ও মুক্তি দুয়ের কর্তা' - শ্রীরামকৃষ্ণের এই বক্তব্য সার্বিকভাবে সার্থক; এতে কোন প্রকার অসংগতি নেই বরং এই বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ বর্তমান। কারণ অচেতন এবং অপূর্ণ-অল্পজ্ঞ কোনকিছু যেহেতু জগৎকারণ হতে পারে না তাই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই যে জগৎকারণ তা আধ্যাত্ম শাস্ত্রগুলিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট এই জগতে তিনি যেমন জীবের বন্ধন-কারক ভোগ্য, কামিনী-কাঞ্চন সৃষ্টি করেছেন তেমনিই জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য ইত্যাদিও রেখেছেন। এখন জীব যেহেতু কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আবার অন্য দিকে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করে মুক্তিপথে অগ্রসর হয়। এবং পরিশেষে ভগবৎকৃপা লাভ করে মুক্ত হয়। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে বন্ধন ও মুক্তির কর্তা বলে বর্ণনা করেছেন। আবার অন্যভাবেও বলা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মতে এই জগৎ হল ঈশ্বরের মায়াবিলাস। এই মায়ার দুই রূপ: বিদ্যামায়া এবং অবিদ্যামায়া। অবিদ্যামায়া জীবকে বন্ধনে আবদ্ধ করে কিন্তু বিদ্যামায়া জীবকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায় এবং মোক্ষ-কারক হয়। এখন ঈশ্বরের মায়া যেমন জীবকে বন্ধনে আবদ্ধ করে তেমনি আবার মায়াই জীবকে মুক্তিপথে অগ্রসর করে, তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও ঈশ্বরকে বন্ধন ও মুক্তির কর্তা বলা যেতে পারে। সুতরাং 'ঈশ্বরই বন্ধন ও মুক্তি দুয়ের কর্তা' - শ্রীরামকৃষ্ণের এই বক্তব্যে কোন প্রকার অসংগতি নেই, ইহা প্রতিপাদিত।

এখন শ্রীরামকৃষ্ণের এই বক্তব্যের ভিত্তিতে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য এই যে যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ঈশ্বরই বন্ধন ও মুক্তির কর্তা তবুও জীবের বন্ধনের ক্ষেত্রে জীবের নিজের ভূমিকা কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ ঈশ্বর জীবের বন্ধন-কারক ভোগ্য বিষয় সমূহ তথা অবিদ্যামায়া সৃষ্টি করলেও জীবের সেই ভোগ্য বিষয় সমূহে আসক্ত হওয়া তথা অবিদ্যামায়ায় বশবর্তী হওয়ার মতো বিষয়গুলি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় বরং জীবের স্বাধীন ইচ্ছা নির্ভর। ফলতঃ জীব যদি স্বেচ্ছায় ভোগ্য বিষয় সমূহে আসক্ত হয় অথবা অবিদ্যামায়ার বশবর্তী

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

হয় এবং ফলস্বরূপ দুঃখ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে কোনভাবেই অকৃতাভ্যাগম দোষের প্রসঙ্গ হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 'ইচ্ছার স্বাধীনতা' বিষয়ে অভিমতটিও প্রাসঙ্গিক হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিকে যেমন ঈশ্বরকে সবকিছুর কর্তা বলেছেন অন্যদিকে তেমনি আবার তিনি জীবের স্বাধীন ইচ্ছাও মেনেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, ঈশ্বরই জীবকে স্বাধীন ইচ্ছাবোধ দিয়ে রেখেছেন কারণ তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হত। তাই জীবের ধর্মাধর্ম জনিত পাপ-পুণ্যের বোধ হয় এবং পাপ-কর্ম থেকে বিরত হয়। জীবের যতক্ষণ না ঈশ্বরদর্শন হচ্ছে ততক্ষণ এই পাপ-পুণ্যের বোধ, ভেদ-ভাব থাকে। কিন্তু যখন ঈশ্বরলাভ হয়, অর্থাৎ যখন সে উপলব্ধি করে 'ঈশ্বরই কর্তা আমি অকর্তা' তখনই তার এই বোধ জন্মায় যে, এই 'স্বাধীন ইচ্ছা' আসলে কথার কথা মাত্র; বস্তুত 'ঈশ্বরই যন্ত্রী আমি তাঁর যন্ত্র'। এরথেকে খুব স্পষ্ট যে বন্ধন দশায় যেহেতু জীবের স্বাধীন ইচ্ছাবোধ থাকে এবং তদনুসারে সে ধর্মাধর্ম কর্মের সাধন করে তাই সেই কর্ম জনিত সুখ-দুঃখ ভোগের জন্য সে নিজেই দায়ী। সুতরাং বন্ধন জনিত জীবের দুঃখ ভোগে অকৃতাভ্যাগম্ দোষের প্রসঙ্গ অবান্তর।

পুনরায় জিজ্ঞাসিত হয় যে, ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় হন তাহলে তিনি বন্ধনকারক অবিদ্যামায়া রেখেছেন কেন যার দ্বারা অমঙ্গল সাধিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, এসব 'তাঁর লীলা, অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না। দুঃখ না থাকলে সুখ বোঝা যায় না। 'মন্দ' জ্ঞান থাকলে তবে 'ভালো' জ্ঞান হয়'[30]। শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটি আপাতভাবে খুব সহজ মনে হলেও তা কিন্তু আসলে দার্শনিক ভাবে খুব ভাবগম্ভীর। কারণ ঈশ্বর লীলাবশে বিনা প্রয়োজনে মায়াশক্তি দ্বারা এই জগৎ-রচনা করেছেন যা সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, বিদ্যা-অবিদ্যা নানান বৈচিত্র্যে সমন্বিত। কিন্তু জগতের এই যে বৈচিত্র্য এবং জীবের এই যে ভোগবৈষম্য তার কারণ কিন্তু জীবের স্বকীয় কর্ম – ধর্মাধর্ম। জীবানুষ্ঠিত এই ধর্মাধর্মের অনুরূপ ফলভোগের জন্য ঈশ্বর তদুপযোগী ভোগায়তন ও ভোগ্য বিষয় সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যাও রেখেছেন। আরও একধাপ এগিয়ে এভাবেও বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, জগৎকারণ যে মায়া তা অনাদি এবং অনাদি সংস্কারবশে জীব যেহেতু মায়ার বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না তাই তার কাছে তার বদ্ধাবস্থাই স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু পরমকল্যাণময় ঈশ্বর হয়তো জীবের মঙ্গলার্থেই অবিদ্যা রেখেছেন কারণ এই অবিদ্যার প্রভাবেই জীব জননমরণাদিসংসারানলে সন্তপ্ত হয় এবং মুক্তিপথে অগ্রসর হয়। এখন যেহেতু সংসার অনলে দগ্ধ না হলে জীবের মুক্তির ইচ্ছা হয় না তাই জীবকে মুক্তিপথে প্রেরিত করার জন্য, মুমুক্ষু করে গড়ে তোলার জন্য, কল্যাণঘন ঈশ্বর জগতে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যাও রেখেছেন। এই কারনেই হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন 'অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না। দুঃখ না থাকলে সুখ বোঝা যায় না'। অর্থাৎ, দুঃখতাপে সন্তপ্ত না হলে মুক্তির মহিমা বোঝা যায় না।

এখন কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন যে, মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরতো সকলকেই মুক্তি দিতে পারতেন, তাহলে তিনি জীবকে বন্ধনে রেখেছেন কেন? খুব সহজ ভাবে স্পষ্ট ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছেন যে, "সবই তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে তিনি এইসব নিয়ে খেলা করবেন। কিন্তু সবাইকে মুক্ত করে দিলে তাঁর এই লীলাখেলা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তিনি সবাইকে মুক্ত করেন না।"[31] কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এই সরল-সাধারণ বক্তব্যের তাৎপর্য কিন্তু খুবই গভীর; কারণ ঈশ্বরের লীলাখেলা হল আসলে নিষ্প্রয়োজনে অনায়াসসাধ্য এই জগৎ-বিশ্বরচনা। কর্মাধ্যক্ষ ঈশ্বর জীবের কৃতকর্মের অনুরূপ ফলভোগের জন্য যথোপযুক্ত ভোগায়তন ও ভোগ্য বিষয় সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত ধর্মাধর্মের ফলভোগ শেষে তিনি আবার এই জগতের প্রলয় সাধন করেন। এখন তাঁকে যদি হঠাৎ সকল জীবের মুক্তি প্রদান করতে হয় তাহলে জীবের ভোগের উপযুক্ত ভোগায়তন ও ভোগ্যবিষয় সৃষ্টি স্তব্ধ করতে হবে, তাতে তাঁর জগৎ-বিশ্বরচনারূপ লীলাখেলা যেমন বন্ধ হয়ে যাবে তেমনি আকস্মিক মহাপ্রলয় প্রসঙ্গও হবে। আবার জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যেখানে জীবের কর্ম-সাপেক্ষ বলে স্বীকার করে পরমেশ্বরের প্রতি পক্ষপাতিতা, নির্দয়তা ইত্যাদি দোষের আশঙ্কার নিরাকরণ করা হয় সেখানে জীবের কর্ম ব্যতিরেকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় (সকল জীবের মুক্তি প্রদানরূপ) মহাপ্রলয় সাধিত হয় বলে দাবী করলে ঈশ্বরের প্রতি পুনরায় পূর্বোক্ত দোষের আশঙ্কা হতে পারে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ এই গূঢ় বিষয়টিকে সহজবোধ্য করে বললেন, "ঈশ্বর তাঁর লীলাখেলার জন্য সকল জীবের মুক্তি প্রদান করেন না"।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসু মনকে নাড়া দিতে পারে তা হল, শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে অহংকারের নাশে মুক্তি হয় নাকি মুক্তিতে অহংকারের নাশ হয়? কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ কোথাও বলেছেন "ঈশ্বর দর্শন না করলে অহংকার যায় না। যদি কারু অহংকার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বরদর্শন হয়েছে।"[32] আবার কোথাও বলেছেন "অহংকার আছে বলে ঈশ্বর দর্শন হয় না"[33] বা "যতক্ষণ অহংকার ততক্ষণ অজ্ঞান, অহংকার থাকতে মুক্তি নাই"[34] বা "যতক্ষণ অহংকার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না; আবার মুক্তিও হয় না"[35] ইত্যাদি কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলে আপাতদৃষ্টিতে আশঙ্কা হতে পারে যে উক্তপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটছে, কারণ তিনি একবার বলছেন ঈশ্বরদর্শনই অহংকার নাশের উপায় আবার একবার বলছেন অহংকারের নাশই মুক্তির বা ঈশ্বরদর্শনের বা ঈশ্বরলাভের উপায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মুক্তিতত্ত্ব একটু অবধানের সঙ্গে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, এই ধরনের আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভকে মুক্তি বলেছেন। এই ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভের যে পদ্ধতি তিনি নির্দেশ করেছেন তাতে এটি খুব পরিষ্কার যে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপরোক্ত বক্তব্য গুলিতে কোন প্রকার অসংগতি নেই। তিনি বলেন প্রথমে মুমুক্ষুকে গুরুর উপদেশ অনুসরণ করতে হয়। গুরুকৃপা হলে গুরুই প্রথমে মুমুক্ষুকে কোনটা সৎ কোনটা অসৎ তা বুঝিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা বাকি সবাই অকর্তা, জীবতো ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র মাত্র। গুরুর এইপ্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হলে মুমুক্ষুর প্রথমিকভাবে 'আমি কর্তা' এই বোধ চলে যায়, অর্থাৎ অহং ত্যাগ হয়। এইভাবে অহং ত্যাগ হলে তিনি নিষ্কামকর্ম করতে করতে অত্যন্ত নির্মল চিত্তের

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

অধিকারী হয়ে শুদ্ধাভক্তি লাভ করেন এবং ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের শরণাগত হন। তারপর তিনি ঈশ্বরের কৃপা প্রাপ্ত হলে ঈশ্বর নিজেই তাঁর নিকট নিজের স্বরূপ উন্মোচিত করেন এবং মায়ার অবগুণ্ঠন মোচিত হয় – একে ঈশ্বরদর্শন বলে। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ এই অবস্থাকে মুক্তাবস্থা বলেছেন তবুও ঈশ্বরদর্শনের পর মুমুক্ষু যখন মায়ার রাজ্য অতিক্রম করে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হন তখন তাঁর অহং প্রকৃতই বিনষ্ট হয় এবং তিনি সমাধিস্থ হন বা ঈশ্বরলাভ করেন। এটিকে মুক্তির পূর্ণতম অবস্থা বলা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত এই প্রক্রিয়ায় এটি খুবই স্পষ্ট যে, প্রাথমিক ভাবে অহং-এর ত্যাগ না হলে ঈশ্বরদর্শন হয় না আবার ঈশ্বরদর্শন হলে তবেই প্রকৃতপক্ষে অহং-এর নাশ হয় এবং সমাধিলাভ বা ঈশ্বরলাভ বা মুক্তিলাভ হয়। তাই এক্ষেত্রে অসঙ্গতির কোন জায়গা নেই। আর যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আশঙ্কা উত্থাপিত হয়েছিল তাও নিতান্তই অমূলক, কারণ প্রাথমিকভাবে যে অহং-ত্যাগ যা না হলে ঈশ্বরদর্শন হয় না এবং প্রকৃতপক্ষে যে অহং-নাশ যা ঈশ্বরদর্শন হলে তবেই সম্ভব হয় – এই দুইটি বিষয় মোটেই অভিন্ন নয়, এদের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে।

মোক্ষের সাধন বিষয়ে যে জিজ্ঞাসাটি পর্যালোচনা করা খুব প্রয়োজনীয় তা হল মুক্তিতে তো অহং-এর নাশ হয়; কিন্তু ভক্তিতে যেহেতু 'আমিত্ব' বা 'অহং' থেকে যায় সেহেতু ভক্তিযোগের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভ কি সম্ভব? এই জিজ্ঞাসার তাৎপর্য হল শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্তি বিষয়ে একবার বলছেন 'যতক্ষণ অহংকার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না; আবার মুক্তিও হয় না'[36] আবার তিনি ভক্তিযোগ বিষয়ে বলেছেন 'আমি দাস, তুমি প্রভু', 'আমি ভক্ত, তুমি ভগবান' – এই অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বরলাভের পরও থাকে, সব 'আমি' যায় না। আবার এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।[37] তাই আশঙ্কা উত্থাপিত হয় যে, ভক্তিযোগের দ্বারা কি প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব? এই আশঙ্কার নিরাকরণ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই করেছেন। মুক্তি অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে ঈশ্বরদর্শন বলেছেন সেই ঈশ্বরদর্শনে অহংকারের নাশ হয় কিনা – এই প্রকার জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন, "কখন কখন তিনি অহংকার একেবার পুঁছে ফেলেন – যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহংকার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহংকারে দোষ নাই"[38]। অর্থাৎ মুক্তিতে অহংকারের নাশ হয় এও যেমন ঠিক আবার মুক্তির পরেও একটু অহংকার থেকে যায় এও তেমন ঠিক। কথাটি পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণের মতে জ্ঞানযোগে অর্থাৎ বিচারের পথে যাঁরা ঈশ্বরদর্শন তথা ঈশ্বরলাভ করেন এবং সমাধিস্থ হন তাঁদের অহংকার বা 'আমি-ভাব' সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন তাঁদের একটু অহং-অভিমান বা 'আমি-ভাব' থেকে যায়। কিন্তু এই 'আমি' ভক্তির আমি; এই 'আমি'তে অহংকার করে না, অজ্ঞান করে না, বন্ধন করে না বরং ঈশ্বরলাভ করিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার সতর্ক করেছেন - এর থেকে আবার কেউ যেন মনে না করে যে, জ্ঞানের পথ ও ভক্তির পথ – এই দুই পথের গন্তব্য ভিন্ন। যে পথেই যাওয়া হোক না কেন মূল গন্তব্য হল

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

ঈশ্বরলাভ তথা স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "জ্ঞান ভক্তি দুইটিই পথ – যে পথ দিয়ে যাও, তাঁকেই পাবে। জ্ঞানী একভাবে তাঁকে দেখে, ভক্ত আর-একভাবে তাঁকে দেখে। জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময়"[39]। জ্ঞান ও ভক্তি দুটিকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন পথ হিসাবে সমান গুরুত্ব দিলেও তিনি যে ভক্তিকে যুগধর্ম বলেছেন তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ভক্তিকে যুগধর্ম হিসেবে উল্লেখ করার একটি কারণও এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "জ্ঞানযোগে অহংকারের নাশরূপ সমাধি হয় বটে তা কিন্তু দু-এক জনের হয়। কারণ এই অহংকার সহজে যাওয়ার নয়। সমূলে এই অহংকারের উৎপাটন করতে না পারলে অশ্বত্থ গাছের ফেঁকড়ির মতো আবার বেরিয়ে পড়ে। তাই এই অহংকারকে বা 'আমি'কে যদি রাখতেই হয় তাহলে ভক্তিপথে গিয়ে সেই আমিকে 'দাস আমি' করে রাখাই ভালো কারণ তাতে অজ্ঞান হয় না, বন্ধন হয় না।"

আর শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলেন, 'অহংকারের নাশ না হলে জ্ঞানও হয় না, মুক্তিও হয় না' সেক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ অহংকার বা আমি-ভাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন: 'বজ্জাৎ আমি' এবং 'দাস আমি' বা 'ভক্ত আমি'। এদের মধ্যে 'বজ্জাৎ আমি' হল সেই 'সংসারী-আমি' যে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত; 'আমি কর্তা' - এই অহংকার যুক্ত এবং অজ্ঞ। সর্বোপরি, এই 'বজ্জাৎ আমি' হল অবিদ্যার আমি। অন্যদিকে 'দাস আমি' বা 'ভক্ত আমি' হল বিদ্যার আমি; সেই আমি যার ঈশ্বরদর্শন হয়েছে এবং এই উপলব্ধি হয়েছে যে 'ঈশ্বরই কর্তা বাকি সবাই অকর্তা'। যার সর্বদা 'আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত, তিনি আমার প্রভু, তিনি আমার ভগবান' – এই প্রকার অভিমান থাকে এবং যার এইপ্রকার অহং-অভিমান কারোর অনিষ্ট করে না। এখন 'অহংকারের নাশ' বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ এই 'বজ্জাৎ আমি'র নাশের কথা বলেছেন কারণ এই অবিদ্যার আমি থাকলে জ্ঞান হয় না, মুক্তিও হয় না। কিন্তু 'বিদ্যার আমি' বা 'দাস আমি' বা 'ভক্ত আমি'তে কোন দোষ নেই কারণ এই আমি অজ্ঞান করে না, বন্ধন করে না। আবার সমাধি বা মুক্তির পরও যে 'আমি' থাকে তা শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, শঙ্করাচার্য সমাধি লাভের পরও 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য। আচার্য রামানুজও 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন। চৈতন্যদেব এই 'আমি' দিয়ে ভক্তি আস্বাদন করতেন ইত্যাদি। আসলে জীবন্মুক্তির অবস্থা স্বীকার করলে মুক্তির পর যে 'বিদ্যার আমি' থাকে তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সুতরাং মুক্তাবস্থায় 'আমি' বা অহংকার থাকা যদি যুক্তিসিদ্ধ হয় তাহলে ভক্তির দ্বারাও প্রকৃতই মুক্তি লাভ সম্ভব।

পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্তির সাধন হিসেবে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি প্রভৃতি নানান পথের বা যোগের কথা বলেছেন কিন্তু 'ঈশ্বরই যখন বন্ধন ও মুক্তি দুয়ের কর্তা' তখন তাঁর কৃপা ছাড়া ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভ বা মুক্তি লাভ কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্টই বলেছেন যে, 'তাঁর কৃপা না হলে সাধন-ভজনে কিছু হয় না। তাই তাঁর শরণাগত হতে হয়'।[40] সুতরাং জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি যে পথেই যাওয়া হোক না কেন 'ভগবৎ-

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

শরণাগতি' ছাড়া কোন ভাবেই ভগবৎ-কৃপা লাভ সম্ভব নয়; আর ভগবৎ-কৃপা লাভ না হলে মুক্তি লাভও সম্ভব নয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের মতে 'শরণাগতি' কিন্তু মুক্তির অনন্য সাধন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মযোগী প্রভৃতি ভগবানের শরণাগত হয়ে সাধন-ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে নিজের চেষ্টায় ভগবান লাভের, মুক্তি লাভের চেষ্টা করেন। অন্যদিকে সাধারণ মুমুক্ষু, যাঁরা সাধন-ভজন প্রভৃতি কিছুই করতে পারে না তাঁরা কেবল ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকে, তাঁর জন্য কাঁদে। তাঁদের এই ব্যাকুলতা ও কান্নায় ঈশ্বর তাঁদের দেখা দেন। তখন তাঁদের ঈশ্বরদর্শন হয়, মুক্তি লাভ হয়।[41] তাই মুক্তির সাধন হিসেবে শরণাগতির অনন্যত্ব কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণই নন ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে শরণাগতিকে মুক্তির অনন্য সাধন বলে উল্লেখ করেছেন।[42]

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদিষ্ট মুক্তিতত্ত্বের যথা সম্ভব বিচার বিশ্লেষণে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, উক্ত মুক্তিতত্ত্বের মূল ভিত্তি হল অদ্বৈতবেদান্ত কারণ তাঁর মতে, স্ব-সচ্চিদানন্দ-স্বরূপতা উপলব্ধিই জীবের পরম লক্ষ্য; যাকে তিনি ঈশ্বরলাভ বলেও বর্ণনা করেছেন এবং তাতেই প্রকৃত মুক্তি। এরূপ বক্তব্যই অদ্বৈতবেদান্তের মর্মবাণী। তবে তাঁর এই অদ্বৈতবাদ আচার্য শঙ্কর প্রচারিত লোকপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ নয়; কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ শঙ্করাচার্যের ন্যায় জগতের সত্যতা অস্বীকার করেননি কিংবা কেবল জ্ঞানমার্গকেই মুক্তির সাধন বলে স্বীকার করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদ অনুসারে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত - সবই মূল সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ; সবই সমান সত্য। আসলে তাঁর অদ্বৈতবাদ হল সমন্বয়ী-অদ্বৈতবাদ। তাই অধ্যাপক শ্রী নীরদবরণ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর *'শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা'* গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন যে, "শ্রীরামকৃষ্ণ একপ্রকার অদ্বৈততত্ত্বই প্রচার করেছেন। কিন্তু, এই অদ্বৈততত্ত্ব নিশ্চয়ই লোকপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈততত্ত্ব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈততত্ত্ব অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত, সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ এবং বিশেষ করে তান্ত্রিক ধারণার সমন্বয়ে বিশ্বাসী। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মতে অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত, সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, শিব-শক্তি সবই সত্য"[43]।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি আরও পরিস্ফুট হয় 'মুক্তির সাধনপথ' বিষয়ে তাঁর অভিমত অনুধাবন কালে; যা তাঁর বিখ্যাত "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যেখানে ইচ্ছা যাও"[44] উপদেশে পরিস্ফুট হয়। অধ্যাপক দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশের তাৎপর্য নিরূপণে বলেন - "শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ : অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেথা ইচ্ছা সেথা যাও। (যা ইচ্ছা তাই কর)। অর্থাৎ অদ্বিতীয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপলব্ধিই চরম লক্ষ্য জেনে, তোমার অধিকার ও রুচি অনুযায়ী সাধনপথ অবলম্বন কর"[45]। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকারিভেদে ও রুচিভেদে সাধকের উপযোগী সাধনমার্গ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি প্রভৃতি মার্গগুলি এককভাবে অথবা সমন্বিতভাবে মুক্তির সাধন হতে পারে; যে সাধকের মধ্যে যে ভাব বেশি তিনি সেই মার্গই অবলম্বন করবেন। এইভাবে তিনি বিভিন্ন সাধনমার্গের মধ্যে অবিরোধ বা সমন্বয়

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

সাধন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি কেবল বৈদিক সাধনমার্গগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন তাই নয়, তিনি স্বয়ং বিভিন্ন ধর্মের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে উপলব্ধি করেছেন যে, প্রতিটি ধর্ম নির্দেশিত পথের দ্বারাই ঈশ্বরলাভ সম্ভব; তাই ধর্মে ধর্মে কোন বিরোধ নেই; বিভিন্ন ধর্ম আসলে একই পরম সত্য লাভের বিভিন্ন পথ মাত্র। তাই স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এই সমন্বয়ভাবগুলি তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে"[46] এবং এইভাবে তাঁর এই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মসমন্বয়ের ভিত্তি স্থাপন করে যা বর্তমান ধর্মীয় বাদ-বিসম্বাদের যুগে মানব সভ্যতার প্রগতির আলোকবর্তিকারূপে মানবমনের যাবতীয় সংকীর্ণতা দূর করে ধর্মীয় সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধ জাগ্রত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরম করুণায় অধিকারিভেদে ও রুচিভেদে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে তাদের উপযোগী সাধনমার্গের দিশা দেখিয়ে সর্বমুক্তির ধারণার যে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা তাঁর দর্শনকে প্রকৃত অর্থে মানবতাবাদী চেতনার প্রভায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র :

1. ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র। *বেদান্ত-পরিভাষা*। সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-তর্ক-সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪-৫
2. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮, পৃ. ১১৫
3. তদেব, পৃ. ১১৫
4. তদেব, পৃ. ১১৫
5. তদেব, পৃ. ৮৬
6. তদেব, পৃ. ৮০
7. তদেব, পৃ. ১১৯
8. তদেব, পৃ. ১২৭
9. তদেব, পৃ. ২২৬
10. তদেব, পৃ. ৩৯৬
11. তদেব, পৃ. ১০১৯
12. তদেব, পৃ. ১৭৫ এবং পৃ. ৩৯৬
13. তদেব, পৃ. ২৪০
14. তদেব, পৃ. ৩১১-৩১২
15. তদেব, পৃ. ২৪৮ এবং পৃ. ৪৫৪

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.31

16. কাঠকোপনিষদ্ – ২। ৩। ১২, *কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কাঠকোপনিষদ্*। সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭, পৃ. ২১৪
17. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮, পৃ. ১১১
18. তদেব, পৃ. ২১২
19. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৯২৯
20. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৩৭
21. তদেব, পৃ. ৬৮৭
22. তদেব, পৃ. ৬৩
23. তদেব, পৃ. ৮৬
24. তদেব, পৃ. ৩৭
25. তদেব, পৃ. ২১
26. তদেব, পৃ. ৩৮
27. তদেব, পৃ. ৪৭০
28. তদেব, পৃ. ৭১৫
29. তদেব, পৃ. ৪৭১
30. তদেব, পৃ. ১৮০
31. তদেব, পৃ. ৮৬
32. তদেব, পৃ. ৪৫৩
33. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৮৪৮
34. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮, পৃ. ১৬৭
35. তদেব, পৃ. ৬৬৭
36. তদেব, পৃ. ৬৬৭
37. তদেব, পৃ. ১২২
38. তদেব, পৃ. ৪৫৩
39. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৮২০
40. তদেব, পৃ. ১১৫২

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

41. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৩৬২-৩৬৩

42. [42] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা - ১৮। ৬৬, ঘোষ, শ্রীজগদীশ চন্দ্র। *শ্রীগীতা*। গৌহাটী, আসাম: দেবালয় লাইব্রেরী, ২০০৫, পৃ. ৫৩৮

43. চক্রবর্তী, শ্রীনীরদবরণ। *শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা*। কলিকাতা: রীডার্স কর্নার, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৯

44. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮, পৃ. ১০৭৪

45. ভট্টাচার্য, দীনেশ। "দর্শনচিন্তায় শঙ্কর-রামানুজ-মধ্ব-শ্রীরামকৃষ্ণ"। *বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ*। সম্পা. স্বামী প্রমেয়ানন্দ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী চৈতন্যানন্দ। কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৫, পৃ. ৬০৯

46. গম্ভীরানন্দ, স্বামী। "দর্শনচিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণ"। *বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ*। সম্পা. স্বামী প্রমেয়ানন্দ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী চৈতন্যানন্দ। কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৫, পৃ. ২৮৪

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore